বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪

সিজোফ্রেনিয়া একটি নিরাময়যোগ্য মানসিক রোগ

ডা. জিল্লুর রহমান রতন

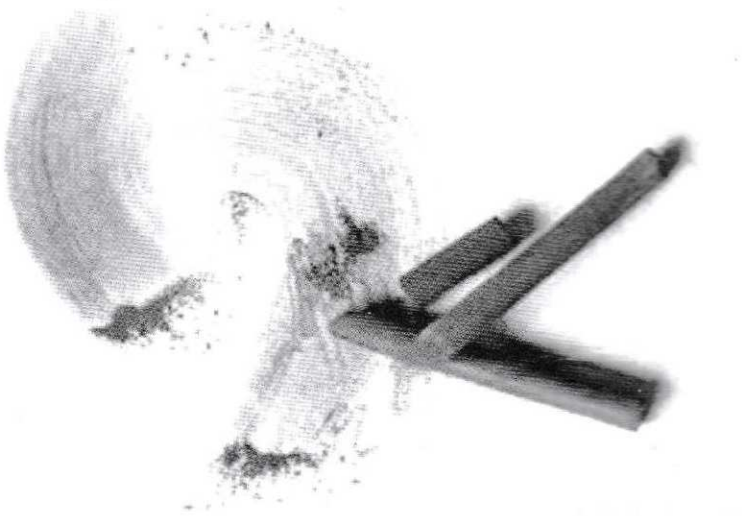

সিজোফ্রেনিয়া একটি জটিল মানসিক রোগ (সাইকোটিক ডিসঅর্ডার)। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও ব্যক্তিসম্পর্ক মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এক সময় সিজোফ্রেনিয়া রোগকে মানসিক রোগের ক্যান্সার বলা হতো। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে, এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সময়মতো চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে অন্য দশজনের মতো সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম জীবনযাপনে সক্ষম। বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক রোগ ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ওর্য়াল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ কর্তৃক ১০ অক্টোবর ১৯৯২ সালে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের সূচনা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও আমাদের দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে। এ বছর এ দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে বাঁচতে শিখি (Living with Schizophrenia)'। সিজোফ্রেনিয়া রোগের চিকিৎসা ও এর নিরাময় সম্পর্কে ধারণার বিষয়টির ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এ বছরের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্যে।

মানসিক রোগের ইতিহাস আর সিজোফ্রেনিয়া রোগের ইতিহাস সর্মাথক। প্রায় ১০০ বছর আগে সুইস মনোচিকিৎসক পল ইউজিন ব্রুয়েলার (১৯১১) কর্তৃক বর্ণিত সিজোফ্রেনিয়া রোগের সাথে বর্তমান ধারণার অনেক তফাৎ। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিক সময়ে এ রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি নিরাময়যোগ্য। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, খোদ ঢাকা শহরের একটি শিক্ষিত পরিবারের সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের চিকিৎসার আওতায় আসতে সময় লেগেছিল প্রায় দুই বছর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি বাস করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যাদের অর্ধেকের বেশি চিকিৎসাসেবাবঞ্চিত। বিপুল এ জনগোষ্ঠী প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার ও চিকিৎসা প্রাপ্তির তথ্যের অভাবে সময়মতো চিকিৎসাসেবার সুযোগ না পাওয়ায়, তাদের কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নের অন্তরায়।

বর্তমান বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়া রোগীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ (শতকরা এক জন)। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় দেখা যায়, আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ১০০০ জনের ০৬ জন সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। বংশগতি ও জিনেটিক কারণ, গর্ভ ও প্রসবকালীন জটিলতা, পরিবেশগত কারণ, নগরায়ন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মানসিক চাপ, অন্যান্য শারীরিক ও জৈবিক কারণ (মস্তিস্কের রসায়ন), বিকাশজনিত সমস্যা ও মনোসামাজিক কারণ সিজোফ্রেনিয়া রোগের জন্য দায়ী। সাধারণত তরুণ বয়সে (১৫-৪৫ বছর) এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে এবং পুরুষদের মধ্যে এ রোগের হার কিছুটা বেশি। জীবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়ে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে একজন ব্যক্তির কর্মক্ষমতা লোপ পায় এবং জীবনের গতিপথ বদলে যায়।

সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অবাস্তব চিন্তাভাবনা, হ্যালুসিনেশন (অলীক প্রত্যক্ষণ) অস্বাভাবিক আচরণ, অহেতুক ও অবাস্তব সন্দেহপ্রবণতা, অসংলগ্ন কথাবার্তা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা না থাকা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভাঙচুর ও সহিংস আচরণ লক্ষ করা যায়। এসব কারণে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির বিচার-বিবেচনাবোধ লোপ পায় এবং দৈনন্দিন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত ও সামাজিক জীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ অন্যদের থেকে ১৫-২০ বছর আগে মারা যায় বিভিন্ন ধরনের শারীরিক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি, আত্মহত্যাপ্রবণতা ও অবহেলার কারণে। কিন্তু সঠিক সময়ে এ রোগ নির্ণয় করে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা (ওষুধ ও মনোসামাজিক চিকিৎসা) সেবা পেলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সক্ষম। নিরাময়ের ধারণাটি নতুন করে এসেছে, যেখানে নিরাময় বলতে শুধুমাত্র রোগের উপসর্গ থেকে মুক্ত হওয়া বুঝায় না। ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে নতুন করে কর্মক্ষম ও সুখী জীবনযাপনই নিরাময়।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্যে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনযাপন ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, পরিবার, মনোচিকিৎসক ও চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ রোগের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসার জন্য ওষুধ একটি গুরুত্বপুর্ণ অনুষঙ্গ। ওষুধ ব্যতীত রোগের উপসর্গের উপশম সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এ রোগের কারণে ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্ম, ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য মনোসামাজিক প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর ব্যক্তিগত

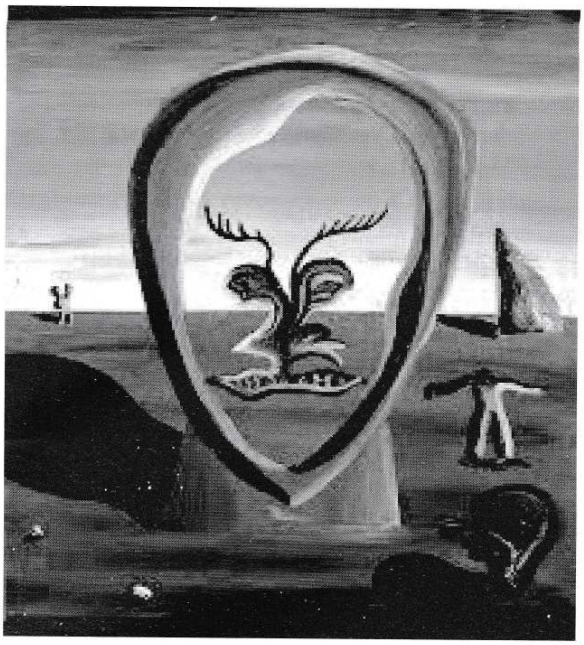

চাহিদা ও তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্মান প্রদান ও ব্যক্তিমর্যাদাকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, সংযত আচরণ করা এবং চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সিজোফ্রেনিয়াসহ অন্যান্য মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা মনোবিদ ও অন্যান্য সহায়ক পেশাজীবীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এজন্য মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞসহ জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন ও পুরাতন সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞসহ সহায়ক পেশাজীবীর নতুন পদ সৃষ্টি এখন সময়ের দাবি। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্তির প্রক্রিয়াটির দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এছাড়াও মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মর্যাদা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বহু প্রতীক্ষিত 'মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট ২০১৪'-এর দ্রুত অনুমোদন জরুরি।

সিজোফ্রেনিয়া ও অন্যান্য মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নির্ণয় করে দ্রুত চিকিৎসাসেবার আওতায় নিয়ে আসতে পারলে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা সম্ভব। মানসিক স্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে ও মানসিক রোগকে অবহেলা করে জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়ন অসম্ভব। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার ও অসচেতনতা। সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনসচেতনতা ও সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা।

সহকারী অধ্যাপক, শিশু-কিশোর মানসিক রোগ বিভাগ,
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা;
দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টস;
E-mail: mzrkhan@gmail.com